Website: https://www.parthasarathipatrika.com

:: ১৯তম অন্তর্জাল সংখ্যা ::

৬ই কার্ত্তিক, ১৪২৮ / 24.10.2021

-: সম্পাদক :-

সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

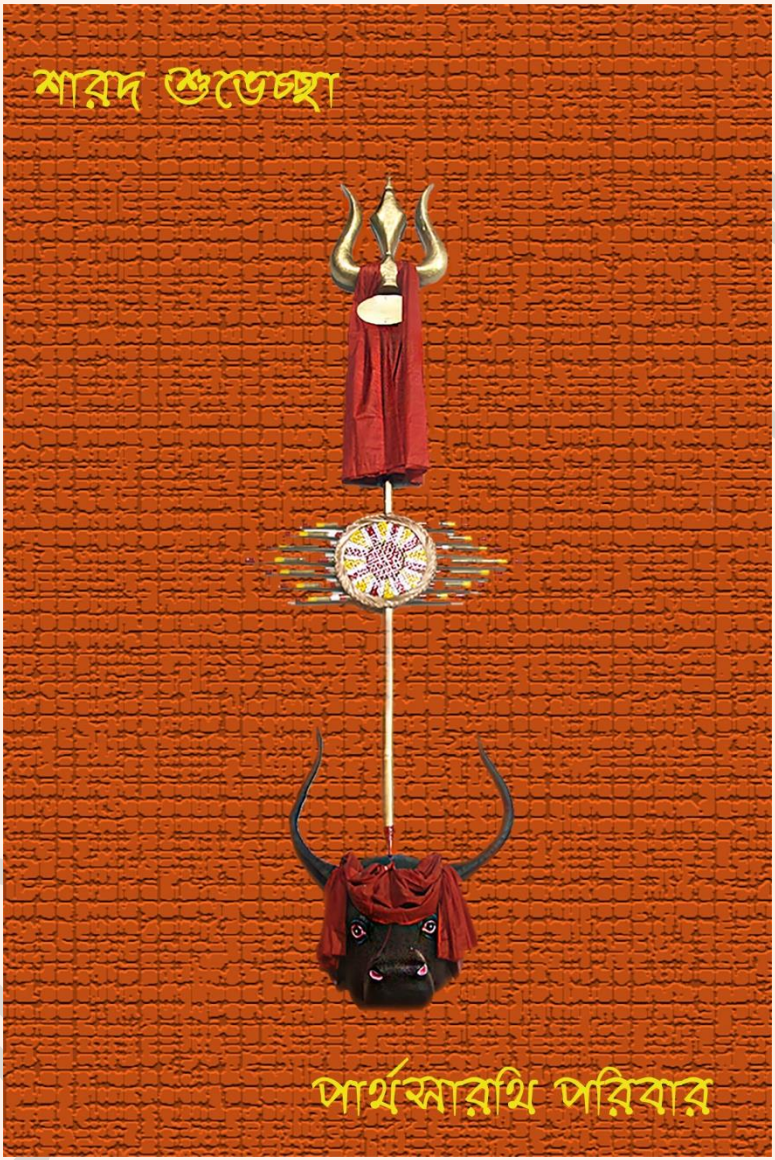
শারদ শুভেচ্ছা
পার্থসারথি পরিবার

-: সূচীপত্র :-

প্রীতি-কণা	শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	শ্রী অনিলবরণ রায়
দেবী মহামায়া	শ্রী প্রভাস চন্দ্র কর
শ্রীরামানুজের অলৌকিকত্ব	ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য
হায়!	শ্রীপ্রকাশ অধিকারী
মহাকাল	শ্রীমতী প্রতিমা নাগ
মৃত্যু উপত্যকা পেরিয়ে	সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

PARTHASARATHI: RNI 5158/ 60 for print format: converted to e-magazine by
Publisher: Sunandan Ghosh during prolonged Nationwide Lockdown in 2020.
Website : https://www.parthasarathipatrika.com
Contact : 182 Jessore Road, Flat- D1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720

(10.03.1926 - 24.11.1986)

প্রীতি কণা

দৃঢ় সংকল্প নিয়ে লক্ষ্যের দিকে পা বাড়াও। কোন অবস্থাতেই বিচলিত হয়ো না। সব বাসনাকে জয় করো, জয় করো লালসাকে। সংসার যেন তোমাকে তোমার লক্ষ্যের থেকে বিচ্যুত না করে। অটুট থাকো সঙ্কল্পে। তোমার মননে, কর্মে এমন কোন কিছু প্রশ্রয় না পায় যা তোমার লক্ষ্যের পথে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

DO NOT COPY

(15.10.1936 - 24.10.2019)

স্মৃতিচারণ **শুক্লা ঘোষ**

আবার একটি দুর্গাপূজা আসছে। আমাদের কিছু করবার নেই। দুটি প্রাণী এ বাড়ির বাসিন্দা। তাদের আর উৎসব করবার মত মানসিকতা থাকবার কথা নয়। তবু বড় হিসাবে আমি ঈশ্বরের কাছে সবার জন্য মঙ্গল কামনা করব। – "যে যেখানে থাকো ভাল থেকো, আনন্দে থেকো। আমাদের কোনও দুঃখ যেন তোমাদের স্পর্শ না করে।"

অবশ্য দুঃখই বা কিসের? মানুষের জন্মগ্রহণের সার্থকতা সেখানেই, যেখানে সে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকে। আমার সংগ্রাম তো শুরু হয়েছে ৩২ বছর আগেই। এখন বরং পাততাড়ি গুটোবার সময়। আমি তো জিতে গেলাম আমার ভালবাসা দিয়ে। আমার পরম পূজনীয় স্বামী সারা জীবন পরোপকার করে পরবাসে থেকেও আমাকে তাঁর আপন গণ্ডীতে বেঁধে রেখেছিলেন। আমার একমাত্র সন্তানও তার স্নেহ ভালবাসার বন্ধনে আমাকে আবদ্ধ রাখলো। আমি জানি একদিন আমার নাতি নাতনীও আমার মায়ায় আমার ভালবাসায় আমার প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে আমার কাছে ফিরে আসবে। আমার ভয় হয় সেদিন আমি তাদের গ্রহণ করতে পারব তো? আর বন্ধন চাই না। সংসার বড় কঠিন ঠাঁই। এখানে কর্তব্য, দায়িত্ব, সমালোচনা, মায়া-মমতা সব একসাথে আক্রমন করে। এর থেকে মুক্তি না পেলে আর মুক্তি কোথায়? এখন আমি সেই মুক্তির সাধনা করছি, যদিও আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে মুক্তি আমার আসবে না।

এবার আসি শ্রীপ্রীতিকুমারের কথায়। এই দুর্গাপূজায় তাঁর নিজস্ব কিছু খরচ ছিল, সেগুলি তিনি ভাগ ভাগ করে সবাইকে দিতেন। সবচেয়ে প্রথমে যার

প্রাপ্য ছিল সে আমাদের "কৌশিক।" সবচেয়ে আগে টাকা নিয়ে বলতেন, "দাদুর জন্য একটা জামা প্যান্ট কিনে এনো।" এবং ঐদিনই রাত্রে বাড়ি ফিরে তাঁকে সেটি দেখাতে হোত। যদি কোনও কারণে না কিনতে পারতাম তাহলে সে রাত্রে ঘন্টাখানেক ধরে কর্তব্যে অবহেলা সম্বন্ধে বকুনি শুনতে হোত। তারপর থাকতো ভাইপো ভাইঝির জামা প্যান্ট। শাশুড়ি, জা, বাকীদের জামাকাপড় আমি কিনতাম। বারবার মনে করিয়ে দিতেন হেনাদির কাপড়টা কেনবার কথা।

সব শেষে আমার ভাগ্যে জুটতো দুশো টাকা। ১৯৫৬ সাল থেকে ঐ দুশো টাকা আমার প্রাপ্য ছিল ভদ্রলোকের এককথার মতো। মাঝে একবছর একশো টাকা বেশী পেয়েছিলাম জুতোর জন্য। ছেলের বিয়ের পর সেটা বাদ চলে গেলো। তখন শাশুড়ী পেতো দুশো টাকা, পুত্রবধূও দুশো টাকা। গতবছর থেকে আমার সেই দুশো টাকা বাদ চলে গেলো। শুনছি ছেলে এবার বলছে আমাকে পুজোয় দুশো টাকা দেবে। ভদ্রলোকের ছেলে তো! "ভদ্রলোকের এক কথা" মতোই চলবে।

শ্রীপ্রীতিকুমারের পুজোর বাজার ছিল দেখবার মতো। ধুতি, পাঞ্জাবী প্রচুর আসতো গীতাদি, শ্রীলা, অনু, মনু, বীথিদি, দেবী, মামীমা, রমেশবাবু, খোকনের মা, মীরা ইত্যাদি প্রত্যেকে তাঁকে পূজায় কাপড়, পাঞ্জাবী, গেঞ্জী ইত্যাদি দিতেন। তাঁরা কতো সুন্দর করে যে সাজিয়ে দিতেন তা দেখবার মতো ছিল। কত শ্রদ্ধা ভালবাসা থাকলে মানুষ অমন ভাবে নিবেদন করতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায়না। প্রথম প্রথম আমার বাবাও তাঁকে কাপড় দিতেন। কবেই যেন সেটা বন্ধ হয়ে গেলো। জামাইষষ্ঠীতেও তাঁর নিমন্ত্রণ জুটেছিল দু'বছর। আমার ছোড়দার বিয়ের পর সেটা বন্ধ হয়ে যায়। কারণ হিসাবে আমরা ধরে নিয়েছিলাম ছোটবৌদির বাপের বাড়ীতে জামাইষষ্ঠীর প্রথা নেই। আজ আর সেসব কারণ খুঁজে লাভ নেই। দিন বদলেছে। বহু বছর পার হয়ে গেছে। তবে প্রথম প্রথম আমি বাবাকে খুব আব্দার করতাম, "বাবা, কিছু দাও না দাও, অন্ততঃ একটা গামছা দিও।" বাবাকে কি বিরক্ত করতাম তা আর বলবার নয়। আমার কথায় কেউ কিছু মনে করতেন না।

শ্রীপ্রীতিকুমারের নিজের ভাইবোনের কাছ থেকে কিন্তু কখনও কিছু দাদার জন্য আসতে দেখিনি। আমার বিয়ের পর তিরিশ বছর কাউকে সম্ভবতঃ আমি কখনও দেখিনি তাঁরা তাদের দাদার জন্য একটি ধুতি হাতে করে এসেছেন। তাঁরা কিন্তু নিয়মিত আমাকে টাকা দিয়ে গেছেন। সেও সেই দুশো টাকা বরাদ্দ, ভদ্রলোকের এককথার মত। প্রথমে আমার, পরে মা ও ছেলের, পরে মা, পুত্র,

পুত্রবধু, ক্রমশঃ নাতি নাতনীদের জন্য। পূজায় টাকা পেলে আমার লাভ হত। কারণ পাহাড়ে যাওয়া আমার নেশা। সমস্ত টাকা আমি ট্রেকিংয়ের জন্য খরচ করেছি। গত বছর থেকে আমি আর টাকা নিই নি, ট্রেকিংয়েও যাই নি। এবারও পূজার বাজার করব না, কোনও দরকারই নেই। শুধু শ্রীপ্রীতিকুমারের আন্তরিক ইচ্ছের কথা মনে রেখেই কৌশিককে কিছু দিতে হবে।

শ্রীপ্রীতিকুমারের জামা কাপড় ষষ্ঠী থেকে আরম্ভ করে দশমী পর্যন্ত আসতো। জামা কাপড়ে অসম্ভব পরিপাটী ছিলেন '৮৪ সাল পর্যন্ত। ১৯৮৫ সাল থেকে আর কোনও দিকে ফিরেও দেখেন নি। নিজের আলমারি নিজেই গুছোতেন। আমাদের ক্ষমতা ছিল না সেদিকে তাকিয়ে দেখবার। সাহায্য করতে গেলে বলতেন, "থাক, তোমরা পারবে না।"

যেখানে যেতেন, একজোড়া জুতো কিনতেন। জুতোর টাকা তিনি কাউকে দিতে দিতেন না। যদি কেউ "দাদা"কে দিয়ে কৃতার্থ হত, নিদেনপক্ষে একটি একটাকার মুদ্রা তার হাতে গুঁজে দিতেন। আমি সম্ভব হলে তাঁকে একজোড়া করে চটী কিনে দিতাম।

কোনও জিনিষ হাতে করে নিয়ে বাচ্চা ছেলের মত আনন্দ প্রকাশ করতেন, যতক্ষ জেগে থাকতেন তাঁর খাটে সেটি থাকতো। মনে হতো যেন সারা জীবন ধরে তিনি ঐ একটি জিনিষই চেয়ে এসেছেন। বিছানার চাদরের প্রতি খুব ঝোঁক ছিল। নরম ছাপা চাদর তাঁর খুব পছন্দ ছিল। শেষের দিকে মীরা, গীতাদি, কিশোর তাঁর জন্য চাদর নিয়ে আসতো। রংটা ভাল করে চোখে দেখতে পেতেন না। জিজ্ঞাসা করতেন, "হ্যাঁগো, এটা খুব ভাল দেখতে, তাইনা?" হাত বুলিয়ে দেখতেন। একটু মোটা ঠেকলে বদলে দিতে বলতেন। একটি চাদরে দশ দিনের বেশী শুতেন না। আমরা এখনও সেই ব্যবস্থাটা চালু রেখেছি। তাঁর বিছানায় কেউ বসতেন না। কিন্তু ক্রিশ হিসি করে বিছানা শেষ করে দিয়েছিল। দাদুর সঙ্গে তার ভীষণ ভাব ছিল। ঐ বিছানায় সে সদাসর্বদা থাকতে ভালবাসতো। দাদুর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের মুহূর্তেও ক্রিশ সেখানেই বসেছিল – একমনে দেওয়ালে কলম দিয়ে দাগ কাটছিল। সে দাগগুলি সে নিজে এসে মুছবে এটা আমার বিশ্বাস। না যদি আসে, ও দেওয়াল অমনিই থাকবে। ক্রিশ শ্রীপ্রীতিকুমারের আধ্যাত্মিকতার ধারক। পৃথিবীর কোনও শক্তি তাকে এখান থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না। আর সেটা দেখব বলেই তো আমি বসে আছি।

পুজোর দিনগুলোতেও শ্রীপ্রীতিকুমার সকালে শ্যামবাজার যেতেন পূজা করার জন্য। স্বাস্থ্য যখন ভাল ছিল অষ্টমীর রাত্রেও সেখানে থাকতেন। দশমীর দিন দুপুরে অনেক টাকার মিষ্টি নিয়ে বাড়ি আসতেন। বিকালে গঙ্গার ঘাটে আমাদের নিয়ে যাওয়া চাইই। কৌশিক আট মাস বয়স থেকে আমাদের সঙ্গে ছায়ার মত আছে। কৌশিককে নিয়েই আমরা ভাসান দেখতে যেতাম। কৌশিককে ঠাট্টা করে আমি নাস্তানাবুদ করে দিতাম। কৌশিক যখন কেবল কথা ভাল করে বলতে শিখেছে, গঙ্গার ঘাটে প্রচণ্ড রেগে বলে উঠেছিল, "দাদু, শুক্লাদির ভাসান হবে না?" দাদুর খুব মজা লেগেছিল কথাটা শুনে। শেষ জীবনেও সেই মজা পেয়েছিলেন জুনকোর কথায়। ২৩শে নভেম্বরের সকালে একা নীচে যাচ্ছিলেন। জুনকো দৌড়ে এসে হাত ধরলো। বলে উঠেছিল, "দাদু আমি তোমাকে ধরছি। আমি তোমাকে নিয়ে Expedition-এ যাব।" উপরে এসে সজল চোখে বললেন, "বাবু, আমার আর ভয় নেই। দাদু আমাকে হাত ধরে Expedition-এ নিয়ে যাবে।" জুনকোর হাত ধরে তাঁর আর Expedition যাওয়া হল না। তিনি একাই চলে গেলেন। কালী পুজোর দিন জুনকো বলেছিল, "দাদু, আমি তোমার কাছে থাকবো।" জুনকোকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। বললেন, "আমার কাছ থেকে তোমাকে কেউ নিয়ে যেতে পারবে না।" --- বিধাতার কি পরিহাস! দাদু থাকা অবস্থায় জুনকোকে কেউ এ বাড়ি থেকে নিয়ে যেতে আসেনি। তাদের নিয়ে যাবার জন্য S.D.J.M. ব্যারাকপুরের Search Warrant এলো দাদু প্রয়াত হবার পঞ্চম দিনে, যখন আনন্দবাজার, যুগান্তর, ষ্টেটস্‌ম্যান, অমৃতবাজার পত্রিকা ও দৈনিক বসুমতীতে ছাপা হয়ে বেরিয়েছে- শ্রীপ্রীতিকুমার আর নেই। .....

লোক এসেছে একের পর এক, এসেছে আঘাত, অপবাদ, এমনকি প্রকাশ্য দিবালোকে মধ্য কলকাতার রাজপথে শারীরিক নির্যাতনও। গত দু বছর প্রায় আমরা দুজন প্রচণ্ড সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কাটিয়েছি। লড়াই করেছি অন্যায় অপবাদের বিরুদ্ধে। "আত্মজন" যদি "ঘরশত্রু" হয়, তার সাথে যোগ দেয় অসংস্কৃত ঔদ্ধত্য আর অপরিণামদর্শী মদগর্বিতা, তাহলে পরিণাম কি নিদারুণ আত্মবিনাশী হয়, তার সাক্ষ্য বহন করছি আমরা।

এখন আর আমাদের কোনও ভয় নেই। কোনও চাহিদাও নেই। বাপীর কথায়, "আর তো আমাদের কিছু হারাবার জন্য নেই!" চক্রবৎ পরিবর্তন্তে – সব কিছুর পরিবর্তন আসছে। ঈশ্বরের বিধান ঈশ্বরই পালন করবেন।**

– – – – – – – – – –

(** রচনা কালঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮)

(অষ্টম অধ্যায়ের নির্বাচিত অংশ-২)

ভগবানকে সম্বোধন করিয়া রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেনঃ

আমার নয়নে তোমার বিশ্ব ছবি
হেরিয়া লইতে সাধ হয় তব, কবি।

ভগবানকে যে এইরূপ অন্তরঙ্গভাবে আহ্বান করা যায়, তিনি যে শুধু এক অতিদূর, অচিন্ত্য, অনির্বচনীয় সত্বা নহেন, আমাদেরই মত একটি ব্যক্তি – যদিও আমাদের অপেক্ষা অতি উচ্চস্তরের ব্যক্তি বা পুরুষ – এটা সম্ভব হইয়াছে গীতার শিক্ষার ফলেই। গীতার পূর্বে উপনিষদে ব্রহ্মের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার নৈর্ব্যক্তিক নির্গুণ নিরাকার নিষ্ক্রিয় ভাবটিই বিশেষভাবে দেওয়া হইয়াছে। গীতার মতে ভগবানের মধ্যে এই নৈর্ব্যক্তিক ভাবও আছে – সেইটিই এই বিশ্বজগতের ভিত্তি বা আধার, কিন্তু সেই সত্বা নিষ্ক্রিয়, সব কিছুর সাক্ষী বা দ্রষ্টা মাত্র, সমানভাবে সবকিছুকে ধরিয়া রহিয়াছে। শুধু ঐটিই যদি সত্য হয় তাহা হইলে বিশ্ব সৃষ্টি করিল কে? এই প্রশ্নের উত্তরেই শঙ্কর বলিয়াছেন – বিশ্ব সৃষ্টি হয় নাই, বিশ্ব বলিয়া যাহা দেখা যায় উহা রজ্জুতে সর্প ভ্রমের মত, নিষ্ক্রিয় নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্মের উপর আরোপ করা হয় – যে শক্তি এই ভ্রম সৃষ্টি করিতেছে তাহাই মায়া।

এই মায়া কি তাহা বলা যায় না, ইহা আছেও বটে আবার নাইও বটে, অনির্বচনীয়া। গীতা এইরূপ ব্যাখ্যা স্বীকার করে না। গীতার মতে মায়া ভগবানেরই শক্তি, ভগবানের মতই তাহা সত্য – ভগবানকেই এই জগৎ প্রকট করিতেছে, এই জগৎরূপ ভগবানেরই আত্মপ্রকাশ – আর আমরা সেই ভগবানেরই অংশ। অসংখ্য কেন্দ্র হইতে ভগবানের আত্মপ্রকাশ এই জগৎকে দেখিতেছি। অর্থাৎ ভগবান নিজেই বহু হইয়া নিজের আত্মপ্রকাশ এই জগৎকে দেখিতেছেন। গীতা পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে সর্ব্ব সাধারণের ধারণার যোগ্য ভগবানের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়াছেন – তিনি এই জগতের ঈশ্বর, সর্ব্বাধিরাজ। তাঁহার জন্যই বিশ্বে সবকিছু আছে, সব কিছু ঘটিতেছে। সব কিছু তাঁরই ভোগের জন্য, তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কোথাও কিছু ঘটিতে পারে না, আর তিনি সকলের সুহৃদ, বন্ধু।

DO NOT COPY

ভগবানকে এইভাবে ধারণা করিলেই সংসারে সকল দুঃখ অতিক্রম করিয়া পরম শান্তি লাভ করা যায়। সপ্তম অধ্যায়ে যে দার্শনিক তত্ব দেওয়া হইয়াছে, ভগবানের প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে তাহাতেই এখন ভগবান সম্বন্ধে আরও পূর্ণ সমগ্র জ্ঞান দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। ভগবানের ব্যক্তির ভাবের এরূপ বর্ণনা প্রাচীন উপনিষদগুলিতেই নাই, অপেক্ষাকৃত আধুনিক শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, গীতা তাহাই অনুসরণ করিয়াছে। এমন কি ঐ উপনিষদের ভাষাই গ্রহণ করিয়াছে।

ভগবান জগতের বহু উর্দ্ধে, জগত অপেক্ষা অনেক বড়। এই অনন্ত বিশ্বজগৎ তাঁর একটি অংশ মাত্র, কিন্তু তিনি আবার আমাদের অতি নিকট, সকলের হৃদয়ের মধ্যেই রহিয়াছেন। মানুষ মানুষের সহিত যতরকম সম্বন্ধ স্থাপন করে, ভগবানের সহিতও তাহা করিতে পারে, এবং তাহাতেই সে সব সম্বন্ধের পূর্ণতা –

পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম। ১১/৪৪

গীতার এই তত্ব পরবর্তী পুরাণগুলিতে ভক্তিযোগ বিকাশের ভিত্তি হইয়াছে এবং এই ভক্তির যে শ্রেষ্ঠ স্তর – রাধাভাব, সেইটিকেই বিশেষভাবে প্রচার করিয়াছেন গৌরাঙ্গ। শ্রী রামদাস বাবাজী কীর্ত্তন করিতেন–

যদি গৌরাঙ্গ না হত
শ্রী রাধার মহিমা রসসিন্ধুসীমা জগতে জানাত কে।

কিন্তু দেহধারী মানব ভগবানের সহিত এই প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করিবে কেমন করিয়া? গীতা সহজ উপায় দেখাইয়াছে। ভগবান বলিলেন, 'যদি কেহ ভক্তির সহিত একটা ফুল বা ফল বা পাতা বা একটু জল অর্পণ করে আমি তাহা প্রেমের সহিত গ্রহণ করি।' এই ভাবে হৃদয় প্রেমের জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু ভগবানকে সম্মুখে স্থূল ভাবে না পাইলে, দেহধারী মানুষের পক্ষে তাঁর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন সম্ভব হয় না। গীতা নিজেই এই প্রশ্নটি তুলিয়া তার উত্তর দিয়াছে। দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথমেই অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন, যারা ভক্তিযোগের দ্বারা তোমার উপাসনা করে, আর যারা জ্ঞানযোগের দ্বারা অব্যক্ত অক্ষয় ব্রহ্মের উপাসনা করে তাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? গীতা এখানে সেই যুগের ব্রহ্ম উপাসনা এবং তার নিজস্ব পুরুষোত্তমের উপাসনা – এই দুইয়ের তুলনা করিয়া শেষোক্তটিকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছে। কারণ ঐরূপ ব্রহ্ম উপাসনা করিয়া যে ফল লাভ

করা যায়, ভগবানকে পাওয়া যায়, ভক্তিযোগ দ্বারা তাহা আরও সহজে পাওয়া যায়। দেহধারী মানুষের পক্ষে অব্যক্ত অক্ষয়ের উপাসনা কঠিন, সাকার পুরুষরূপে ভগবানের উপাসনা তাদের পক্ষে সহজ। কিন্তু ভগবানের আকার কি? শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জ্জুনের সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন – এখন তো তিনি নাই। আমরা কার নিকট আত্মসমর্পণ করিব? গীতা অষ্টম অধ্যায়ে দিব্য পুরুষের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে, ভগবানের রূপ আছে, আকার আছে, কিন্তু তাহা মানব মনের চিন্তার অতীত, অচিন্ত্য। বলা হইয়াছে, মানুষ যে সূক্ষ্মতম বস্তু কল্পনা করে – অণু, ভগবান তাহা হইতেও সূক্ষ্ম। অণুর আকার দেখা দূরে থাকুক তা চিন্তাও আমরা করিতে পারিনা, কেবল বিজ্ঞানের মাধ্যমে তার ক্রিয়া ও অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা হয়। ভগবান যদি তাহার অপেক্ষাও সূক্ষ্ম হন, তবে কি তাহার আকার? আধুনিক বিজ্ঞান অণুর মধ্যে কল্পনাতীত শক্তির অস্তিত্ব শুধু আবিষ্কারই করে নাই, তাহাকে লইয়া মহা মারণাস্ত্র সৃষ্টি করিতেছে – কিন্তু ঐ সূক্ষ্ম বস্তুর মধ্যে এত শক্তি কোথা হইতে আসিল বিজ্ঞান তাহার ব্যাখ্যা দিতে পারে নাই। উপনিষদ ও গীতায় আমরা পাইতেছি – ভগবানই এই বিশ্বজগৎ হইয়াছেন। জগতের সূক্ষ্মতম বস্তু তিনি, আবার মহত্তম বস্তুও তিনি।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা ।

ভগবানের শক্তিই সর্বভূতের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে। জড় বা Matter বলিয়া আমরা যাহা দেখিতেছি উহা চৈতন্যেরই (Conciousness) একটি রূপ। জড়ের মধ্যে চৈতন্য নিজেকে এমন ভাবে লুকাইয়াছে যে তাহা মানবের ইন্দ্রিয়গোচর নহে। মানুষের তৈরি কোন যন্ত্রেও তাহা ধরা পড়ে না। আমাদের এই মানবদেহ জড় অণুর দ্বারা গঠিত। ইহা পৃথিবীতে জীবের শ্রেষ্ঠ মূর্তি হইলেও ইহা অশেষ দোষ ত্রুটিতে পূর্ণ। ইহাতে যৌবনে সৌন্দর্যের বিকাশ হয় বটে কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতে মানব দেহকে জরা ব্যাধি ও মৃত্যু হইতে মুক্ত করিবার যে চেষ্টা চলিতেছে তাহা যে একদিন সিদ্ধ হইবেই – তাহার প্রমাণ এইখানে। জড় ভগবদ্ চৈতন্যেরই একটি রূপ, অতএব তাহাতে ভগবদ্ ভাবের পূর্ণ বিকাশ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ ইহাই হইতেছে এই বিশাল জড় জগৎ সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য – জড়কে ভিত্তি করিয়া বহুরূপে ভগবানের আত্মপ্রকাশ। ভারতে মাটি ও পাথর দিয়া দেব দেবীদের প্রতিমা গড়ার যে প্রথা বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে, ইহাতে পাই ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিত। এই জড়দেহে মানুষই হইবে দেবদেবী। বস্তুতঃ দেবদেবী আছেন, কিন্তু তাঁহাদের যে প্রতিমা গড়া হয়

তাহার সহিত মিল নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুর্গা বা কালীর যে প্রতিমা গড়িয়া আমরা পূজা করি তাহা আদৌ দুর্গা বা কালীর মূর্তি নহে – তবে ঐ প্রতিমার ভিতর দিয়া দুর্গা বা কালীর চরিত্রের কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হয়। এটা একটা আর্ট। ভাষার সাহায্যে যেমন অধ্যাত্ম সত্যকে ব্যক্ত করা হয়, চিত্র বা মূর্ত্তির সাহায্যে তাহা ব্যক্ত করা আর একটা পদ্ধতি বা আর্ট। এইরূপ আর্ট হিসাবে প্রতিমা গড়ার সার্থকতা আছে, ষোড়শোপচারে পূজার জন্য নহে। পূজা করিবার সময় আমরা প্রতিমাকেই দুর্গা বা কালীর মূর্ত্তি মনে করি, ইহা সম্পূর্ণ ভুল। রামপ্রসাদই গাহিয়াছেনঃ

মায়ের মূর্ত্তি গড়াতে চাই, মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে।
মা বেটি কি মাটির মেয়ে, মিছে খাটি মাটি নিয়ে।।
করে অসি মুণ্ডমালা, সে মা-টি কি মাটির বালা,
মাটিতে কি মনের জ্বালা দিতে পারে নিভাইয়ে?
শুনেছি মার বরণ কালো, সে কালোতে ভুবন আলো,
মায়ের মত হয় কি কালো, মাটিতে রঙ মাখাইয়ে?
মায়ের আছে তিনটি নয়ন, চন্দ্র সূর্য্য আর হুতাশন,
কোন কারিগর আছে এমন, দিবে একটি নিরমিয়ে?

বহির্মুখী মানুষ যাহা চায়, অর্জ্জুন ভগবানের স্থূল রূপ দেখিতে চাহিলেন। তাঁহাকে বিশ্বরূপ দেখান হইল। বস্তুতঃ গীতার ঐ বর্ণনাও রূপক, symbolical. ভগবানের উহা রূপ নহে – তবে তিনি অরূপ নহেন, মানুষের যেমন রূপ, যেমন দেহ, ভগবান কতকটা সেই রকমই – মানুষ ভগবানেরই একটি রূপ – তবে ভগবানের স্বরূপের তুলনায় মানুষ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। তাই আমরা দেখি বিশ্বরূপের মানুষের মতো হাত আছে, পা আছে, মুখ আছে – কিন্তু সে সবই অসংখ্য। ভগবান একদিকে ধ্বংস করিতেছেন আবার সেই সঙ্গেই সৃষ্টিও করিতেছেন, রক্ষাও করিতেছেন। ভগবানের এই চরিত্র গীতার বিশ্বরূপের বর্ণনায় জীবন্ত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

বাঙ্গালীর কালীমুর্ত্তিকে গীতার বিশ্বরূপের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা যাইতে পারে। ভগবানের রূপ অচিন্ত্য, তবু তাঁকে যাতে মানুষ চিন্তা করিতে পারে, উপনিষদের অনুসরণে গীতায় বলা হইয়াছে – আদিত্যবর্ণং – তিনি সূর্য্যের মত জ্যোতির্ময়। সুর্য্যোদয়ে যেমন সকল অন্ধকার দূর হইয়া যায়, ভগবানকে পাইলে মানুষের সব অজ্ঞান অন্ধকার দূর হইয়া যায়, মানুষও ভগবানের ন্যায় জ্যোতির্ময়

হইয়া উঠে। ভগবানকে আমরা দেখি নাই, কিন্তু সূর্য্যকে ত দেখিতেছি – ভগবান ঐরকম ধরিয়া লইলে ভগবানকে চিন্তা করা সম্ভব হয়। গীতার দশম অধ্যায়ে তাই জগতের সকল সুন্দর, শক্তিময়, জ্যোতির্ম্ময় জিনিসকেই ভগবানের প্রতীক বলিয়া দেখিতে বলা হইয়াছে। প্রতিমাকে যদি আমরা সেইরূপ প্রতীক বলিয়া দেখি তাহাতে ভুল হয়না, ভগবানকে বুঝিতে ধ্যান করিতে সাহায্যই হইতে পারে। কিন্তু প্রতিমাকে পূজা করিবার কোনই সার্থকতা নাই। বাঙ্গালীর দুর্গাপূজা প্রাচীন বৈদিক যজ্ঞেরই আধুনিক সংস্করণ। গীতা বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের নিন্দা করিয়াছে। প্রাচীন কালে ভারতে যে যজ্ঞ প্রথা প্রচলিত ছিল, বেদে সেইটিকে রূপক হিসাবে গ্রহণ করিয়া নিগূঢ় অধ্যাত্ম সত্য প্রকাশ করা হইয়াছে। কালক্রমে লোকে ঐ অধ্যাত্ম-সত্য হারাইয়া ফেলে, বাহ্যিক যজ্ঞানুষ্ঠানকেই সব বলিয়া মনে করে।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।
বেদবাদরাতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ।। ২/৪২

বৈদিক যজ্ঞের ন্যায়ই দুর্গাপূজা ক্রিয়াবিশেষবহুল, ষোড়শোপচার, কত নৈবেদ্য, কত পদ্মপুষ্প, ধূপ ধূনার আয়োজন। বহির্মুখী মানুষ এই সবেই খুব তৃপ্তি পায়। বলা হয় এই পূজা করিলে ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ, সব আধিব্যাধি দূর হইয়া যাইবে। কিন্তু বস্তুতঃ আমরা কি দেখিতেছি? বৎসর বৎসর এত ধূমধামের সহিত দুর্গতিহারিনী দুর্গার পূজা করিয়াও বাঙ্গালীর আজ এত দুর্গতি কেন? সম্প্রতি আনন্দবাজার পত্রিকায় বলা হইয়াছে – "এককালে যে সামন্ততন্ত্র (জমিদারী প্রথা) ছিল দুর্গাপূজার প্রধান পৃষ্ঠপোষক, তাদের ভগ্নদশা ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের দুর্গাপূজায় আর সেই গ্রামীন জৌলুস নাই। এখন সেই বিরাট নাট মন্দিরে শুধু পায়রার বাসা। পূজার সময়ে ভগ্ন বেদী খাঁ খাঁ করে, দূরের বারোয়ারীতলা থেকে আরতির বাজনা শূন্য মন্দিরে প্রতিধ্বনি হয়ে ফেরে।"

বস্তুতঃ দুর্গাপূজা জমিদারদের জৌলুস দেখাবার ক্ষেত্র ছিল। সেজন্য আমরা দুর্গোৎসব উঠাইয়া দিবার অবাস্তব প্রস্তাব করিতেছি না। বাঙ্গালী জীবনে দুর্গোৎসব দিব্য জীবনেরই ভিত্তি রচনা করিয়াছে – ইহার মূলে রহিয়াছে জীবনকে সুন্দর আনন্দময় করিবার জন্য জগন্মাতাকে আহ্বান করা। তবে সেজন্য ইহা হইতে মিথ্যাকে দূর করিয়া সত্য শিব সুন্দরের উৎসব করিয়া তুলিতে হইবে। প্রথমেই বুঝিতে হইবে ঐ প্রতিমা দুর্গার মূর্ত্তি নহে। উহা রূপক মাত্র। দুর্গার মূর্ত্তি

আছে ভক্তের কাছে। মা স্বরূপে দেখা দেন, সে রূপ মাটি বা পাথর দিয়া কেহ গড়িতে পারে না। বরং যে কোন স্ত্রীলোককে মায়ের একটি মূর্ত্তি বলিয়া পূজা করিলে তাহাতে অনেক ফল পাওয়া যায়। চণ্ডীতে বলা হইয়াছে –"স্ত্রীয়াঃ সমস্তা সকলা জগতসু"। জগতের সকল স্ত্রীলোকই স্বয়ং জগন্মাতা। মনু সংহিতায় বলা হইয়াছে, "যেখানে স্ত্রীলোকের পূজা হয়, সেখানে সকল দেবতারা বিরাজ করেন। যেখানে স্ত্রীলোকদের অসম্মান করা হয়, সেখানে সকল জীবন ও ধর্ম্ম নিষ্ফল হয়।" হিন্দুরা স্ত্রীলোকদের অবমাননা করিয়াছে, তাই আজ হিন্দুজাতির এত দুর্দশা। এই জাতিটাকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে হইলে প্রতিমা পূজা বন্ধ করিয়া গৃহে গৃহে স্ত্রীলোকদিগকে পূজা করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। হিন্দুরা স্ত্রীলোকদের কিরূপ অবমাননা করিয়াছে গীতার প্রথম অধ্যায়ে অর্জ্জুন কর্তৃক ধর্ম্মব্যাখ্যাই তার দৃষ্টান্ত। অর্জ্জুন জাতিভেদকেই সনাতন ধর্ম্ম বলিলেন, এবং যুদ্ধে পুরুষরা নিহত হইলে স্ত্রীলোকেরা দুশ্চরিত্র হইবে, তাহাদের গর্ভে জারজ সন্তান উৎপন্ন হইলে পিতৃপুরুষগণের পিণ্ডলোপ হইবে, তাঁহারা নরকে পতিত হইবেন। ধর্ম্মের গ্লানি কাহাকে বলে তাহা দেখাইবার জন্যই গীতার প্রথম অধ্যায়ে অর্জ্জুন কর্তৃক ধর্ম্ম ব্যাখ্যা। অর্জ্জুন নিজেই পরে স্বীকার করিলেন যে, তিনি ধর্ম সংস্কার ও ধর্মতত্ত্ব ঠিকমত বুঝিতে পারেন নাই। অথচ আজ দেশে ধর্মের নামে যাহা চলিতেছে তাহা গীতার প্রথম অধ্যায়ে অর্জ্জুন কর্তৃক ব্যাখ্যাত ধর্ম্ম, গীতা কথিত শাশ্বত ধর্ম্ম নহে। আজও আমরা স্ত্রীলোকদিগকে যথাসম্ভব পুরুষদের নিকট হইতে স্বতন্ত্র রাখিবার চেষ্টা করিতেছি, পাছে স্ত্রীলোকেরা দুশ্চরিত্র হয়! পুরুষেরা যেন খাঁটি সোনা, কিছুতেই তারা ময়লা হয়না, আর স্ত্রীলোকেরা পিতল কাঁসা, মাজিয়া ঘষিয়া না রাখিলে ক্ষণে ক্ষণে ময়লা হইয়া যাইবে। আর যৌন ক্রিয়াটিই যেন তাহাদিগকে ময়লা করিয়া দেয়। বস্তুতঃ মৈথুন আহার ও নিদ্রার ন্যায় একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। উহা পুণ্যও নহে পাপও নহে। উহার জন্য কেহ অপবিত্র হইয়া যায় না। আর কাহারও ঔরসে যদি তাহাদের গর্ভ হয়, সন্তান হয়, সেটাকে পাপজন্ম, পাপযোনি বলা ভুল। গীতাতে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, কোন পুরুষের ঔরসে যে কোন স্ত্রীলোকের গর্ভ হউক না কেন, সেই সন্তানের পিতা স্বয়ং শিব আর মাতা স্বয়ং জগজ্জননী দুর্গা। (১৪/৪)।

বাহিরের কোন কাজই পাপ বা পুণ্য নহে, ভিতরের কি প্রেরণা হইতে কাজ করা যায় তাহার উপরেই পাপ পুণ্য নির্ভর করে। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, মানুষের ইচ্ছা না থাকিলেও তাকে জোর করিয়া পাপ করায় কে? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিনম ।। ৩/৩৭

"রজোগুণ হইতে উৎপন্ন যে কাম এবং ক্রোধ (যাহা বাধাপ্রাপ্ত কামেরই রূপান্তর) এই উভয় কিছুতেই তৃপ্ত হয়না, ইহারা মহাপাপরূপ। ইহাদিগকে আত্মার পরম শত্রু বলিয়া জানিবে।"

ইহা হইতে বুঝা যায়, সমাজে পাপীদের যে শাস্তি দেওয়া হয়, স্ত্রীলোকেরা সমাজ বিরুদ্ধ কাজ করিলে তাহাদের পতিতা করা হয় – ইহা সত্যধর্ম্ম নহে, বস্তুতঃ ইহা ধর্ম্মের গ্লানি, ধর্ম্মের নামে মিথ্যাচার। মানুষ যখন নিজের ইচ্ছায় পাপ করে না, প্রকৃতির তাড়নায় অবশ হইয়া পাপ করে, তখন তাহাকে সাজা দেওয়ার কোনই সার্থকতা নাই, যাহাতে সে তাহার প্রকৃতিকে সংশোধিত করিতে পারে সেই শিক্ষাই দেওয়া উচিত। দুর্গা প্রতিমার সাহায্যে সেই শিক্ষাই দেওয়া হইয়াছে। মহিষাসুর হইল ক্রোধের প্রতীক, আর পশুরাজ সিংহ কামের প্রতীক। মা অসুরকে বধ করিতেছেন, কিন্তু কামরূপ পশুকে পায়ের তলায় রাখিয়াছেন, তাহার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছেন। রক্ত মাংসের শরীরে কাম ক্রোধের বেগ আসিবেই। যে সেই বেগ সংযত করিতে পারে, গীতা বলিয়াছে, "তাহারাই যোগী এবং তাহারাই সুখী" (৫/২৩)। পশু এই বেগ সংযত করিতে পারেনা, কিন্তু মানুষের সে শক্তি আছে। ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে সে ইহাদিগকে দমন করিতে পারে, তবে সেই ইচ্ছাশক্তিকে ভগবদ্ শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত করিতে হয়। সাধক নিজের মধ্যে ভগবদ্ শক্তিকে আহ্বান করিলে শ্রীমায়ের ইচ্ছার সহিত মানুষের ইচ্ছা যুক্ত হয়, তখন সেই ইচ্ছার পক্ষে সবকিছু করাই সম্ভব হয়। নিজের মধ্যে এইভাবে ভগবদ্ শক্তিকে আহ্বান করাই দুর্গোৎসবের মূল সত্য। বাঙালী বৎসরের পর বৎসর জগন্মাতাকে এইভাবে আহ্বান করিতেছে। কিন্তু মা কি সত্যই আসিয়াছেন? তিনি আসিলে বাঙালীর জীবন আজ দিব্য জীবনে পরিণত হইত। দুর্গোৎসব তিন দিনেই সমাপ্ত না হইয়া তাদের সারা জীবনই হইত নিরবচ্ছিন্ন দুর্গোৎসব। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দুর্গাস্তোত্রে ইহাই সুস্পষ্ট করিয়াছেন।

"মাতঃ দুর্গে! তোমাকে পাইলে আর বিসর্জন করিব না, শ্রদ্ধাভক্তি প্রেমের ডোরে বাঁধিয়া রাখিব। এস মাতঃ! আমাদের মনে প্রাণে শরীরে প্রকাশ হও।

বীরমার্গ প্রদর্শিনী, এস! আর বিসর্জন করিব না। আমাদের অখিল জীবন অনবচ্ছিন্ন দুর্গাপূজা, আমাদের সর্বকার্য্য অবিরত পবিত্র, প্রেমময়, শক্তিময়, মাতৃসেবাব্রত হউক, এই প্রার্থনা। মাতঃ, উর বঙ্গদেশে, প্রকাশ হও।"

আমরা যদি আন্তরিকভাবে এই প্রার্থনা জানাই তবেই দুর্গোৎসব সার্থক হইবে। সেইজন্য যে ঐরূপে প্রতিমা গড়িতেই হইবে এমন কোন কথা নাই। প্রতিমা রূপক মাত্র। জগন্মাতার চরিত্র নানা উপমা বা রূপকের ভিতর দিয়া প্রকাশ করা যায়। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার দুর্গাস্তোত্রে মায়ের যেমন বর্ণনা দিয়াছেন তাহার সহিত প্রতিমার মিল নাই।

দেবী মহামায়া **শ্রী প্রভাস চন্দ্র কর**

শরতের আনন্দ উচ্ছল দিনগুলি; তখন অগাধ বারিধির ন্যায়ই আকাশ সুনীল। নাই তখন শীতকালীন রুক্ষতা। বরং কবিগণের কাব্যস্ফুরণের অনুকূল আবহাওয়ামণ্ডিত। এমন দিনে দেবী মহামায়ার শুভাগমন। 'আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি' - এমনিভাবে শ্রীশ্রী দুর্গাদেবীর শুভ উপস্থিতি সাড়ম্বরে ঘোষিত হইল।

মহাকবি কালিদাসের অমর লেখনী প্রসূত শরতের বর্ণনাঃ

ভিন্নাঞ্জন-প্রচয়-কান্তি নভো-মনোজ্ঞং
বন্ধুক-পুষ্পরচিতারুণতা-চ ভূমিঃ।
বপ্রাশ্চ-পক্কফলমাবৃত-ভূমিভাগাঃ
প্রোৎকন্টয়ন্তি ন মনো ভুবিকস্য মূনঃ।।

দলিত অঞ্জনবৎ কমনীয় কান্তি মনোহর আকাশমণ্ডল, বাঁধুলি পুষ্পের সুলোহিত আভায় আরক্ত কলেবরা এই ধরিত্রী এবং সুপক্ক ধান্য সমাচ্ছন্ন ইতস্ততঃ শোভমান শস্যক্ষেত্ররাজি, আজ কাহার হৃদয় না আকুল করিয়া তুলিতেছে?

তাঁহারই সুললিত রচনার অন্য এক শ্লোকের এইরূপ ইংরাজি অনুবাদ-

Green the rich-fields, laden plants
Are shivering to the breeze;
Which in his brick caresses dance
The blossom-burdened trees;
He ruffles every lily-pond,
Where blossoms kiss and part."

দেশমাতৃকার প্রাণে পড়িয়া যায় নবজীবনের, নূতন চেতনার সাড়া। তখন–

‘কুসুম–ভূষণ–জড়িত–চরণে
দাঁড়ায়েছে মোর জননী!
আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্যে
হাসিছে নিখিল অবনী!’

আধুনিক দুর্গাপূজা যুগাতীত কালের ঐতিহ্যের অভিব্যক্তি ও ভাবধারাবাহিত। প্রশ্ন উঠে, তাহা হইলে বৈদিক যুগে কি দেব মূর্ত্তি প্রচলিত ছিল? এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়াছিলেন Hindoosthan (ত্রৈমাসিকের) জানুয়ারী ১৯৪৪ সংখ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগীশ্বরী অধ্যাপক অর্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায় (অনুবাদ সংস্কৃত):–

ঋগ্বেদে, অথর্ববেদে এবং ব্রাহ্মণগুলিতে সচরাচর দেবগণের সংখ্যা তেত্রিশ বলা হয়। ...ঋগ্বেদে এই তেত্রিশজনকে এগার সংখ্যার তিন মণ্ডলী বা বর্গে বিভক্ত করা হয়, তাঁহাদের বণ্টন করা হয় পৃথিবীতে, বায়ুতে, স্বর্গে বিশ্বের তিন বিভাগে। ...গোড়াকার বৈদিক চিন্তনে সর্বেশ্বরবাদ (Patheism) অদ্ভুত আকারে প্রকাশ পায়।

...বৈদিক স্তবগুলি মূলে হইল দেবগণের কল্পনাপ্রসূত অনুধ্যান, যদিও এইগুলি পরবর্তীকালের মূর্তিসমূহের ধ্যানের প্রতীক বা অনুশীলন করা সূত্রগ্রন্থনা হইয়া দাঁড়ায় নাই। দাবী করা হয় যে, বৈদিক স্তবগুলির বর্ণনায় ও স্তুতিবাদগুলিতে মূর্তি গঠনের সব বীজই নিহিত রহিয়াছে। বৈদিক যুগের গোড়ার দিকে বাস্তব মূর্তিনিচয় সত্যই যে প্রস্তুত করা হইয়াছিল বা নির্দেশিত হইয়া থাকিতে পারিত– এই তত্ত্বের বিপক্ষে সিদ্ধান্তমূলক কিছুই নাই।

স্তবগুলির অনেকগুলিতে বন্দিত দেবগণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা রহিয়াছে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত বিস্তৃত বিবরণ সহকারে। একক আলেখ্যগুলির আভাস এইগুলি দিয়া থাকে। ...

ঋগ্বেদের মূল অংশে আমরা নিজেদের সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতেছি। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি এই মতবাদ পোষণ করিয়াছেন যে, মূর্তিসমূহ ও বিগ্রহাদির ব্যবহার ও প্রচলন হইয়াছে পরবর্তী বৈদিক যুগে, খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক হইতে। পক্ষান্তরে ইহা একেবারে সন্দেহজনক যে, ঋগ্বেদের কালে মূর্তিসমূহ যথার্থই প্রস্তুত ও পূজিত হইয়াছিল কিনা।

ঋগ্বেদের (৫.৫২.১৫) এক অংশে ডঃ বল্লেনসেন (Dr. Ballensen) মারুতদিগের মূর্তিসমূহের এক নজীর উদ্ঘাটন করিয়াছেন, "এই (এষাম্) মূর্তিগুলির দেবগণকে- মারুতগণকে"...

কিন্তু ঋগবেদের (৪.২৪.১০) অপর এক অংশ জোগাইতেছে একেবারে নিরাকরণকারী সাক্ষ্য- "দশটি গোদান দ্বারা... কে আমার এই ইন্দ্রকে ক্রয় করিবে (বা ভাড়া করিবে) ...বোধ হয় ইহা বাজারে জনৈক মূর্তি বিক্রেতার বিলাপ। বৈদিকযুগের গোড়ায় ব্যবহৃত বৈদিক দেবতা ইন্দ্রের বাস্তব প্রতিকৃতি, মূর্তি অথবা প্রতিমার নিঃসন্দেহে ইহা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক সাক্ষ্য।

কয়েকটা কালজয়ী স্মারক বস্তুর দ্বারা গোড়ার বৈদিক মূর্তি সমূহের কয়েকটা প্রকৃত দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়াস পাইব। ঋগ্বেদের অনুমান করা সময়ের সঙ্গে মহেঞ্জদারোর শিব সমকালীন।

কর্লিগুহায়, যার সময় দেওয়া হয় খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক, হস্তীর উপর আরূঢ় ইন্দ্রের বিখ্যাত প্রতিকৃতিটিকে প্রথম দিকের বৈদিক কালের ভিত্তির উপর বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

বৈদিক যুগে মূর্তিসমূহের অস্তিত্বের সম্ভাবনার বিপক্ষে চিন্তা করিয়া যে সব বৈদিক পণ্ডিতেরা দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন তাহাদের পূর্বেকার মনোভঙ্গীর গুরু পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন। গোড়ারদিকে বৈদিক যুগে কি মূর্তিনিচয় বিরাজ করিত? -এই প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর টানিয়া বাহির করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট বিষয় বস্তুর উল্লেখ করা হইয়াছে...।"

জনশ্রুতি অনুসারে বেদ অপৌরুষেয়। স্মরণাতীত কালে প্রাজ্ঞ ঋষিগণ ইহার ধাতা। পরবর্তী কোন এক সময়ে বেদ লিখিত আকারে নীত হইয়াছিল। Max Muller তাঁহার Lectures on the origin and growth of religion গ্রন্থে লিখিয়াছেন- "There is nothing more ancient and primitive not only in India, but in the whole Aryan world, than the hymns of the Rig Veda." W.W.Hunter তাঁহার Imperial Gazetteer (1885) এ লিখিয়াছেন "Rig-Veda is a very old collection of 1017 poems containing 10,580 verses."

এ হেন ঋগ্বেদ, বিশেষজ্ঞদের অনুমানে, খৃষ্টীয় যুগের তিন থেকে চার বর্ষ পূর্বে বর্তমান কলেবর গ্রহণ করিয়াছেন।*

DO NOT COPY

(*এই প্রসঙ্গে তুলনীয় B. G. Tilak: Arctic Home of the Vedas, 1925; Vaidya: History of Sanskrit Literature, 1930)

এই অতীব সুপ্রাচীন গ্রন্থ সনাতন ধর্মের উৎস এবং তৎকালীন সংস্কৃতির নিগূঢ় সমীক্ষণস্বরূপ। ইহার দেবীসূক্ত অংশে আদ্যাশক্তির প্রথম পরিচয় মিলিয়া থাকে। স্বয়ং জগন্মাতা বিশ্বে আপনাকে ভক্তের নিকট চারিরূপে প্রকাশ করিয়াছেন - জ্ঞান (মহেশ্বরী মায়ের জ্ঞানঘন মূর্তি), শক্তি (মহাকালী শক্তিঘন মূর্তি), শ্রী (মহালক্ষ্মী মায়ের শ্রীমূর্তি) এবং পূর্ণতার মূর্তিতে মহাসরস্বতী (জননীর পরম পূর্ণতার প্রতীক।

বেদের আরণ্যক অংশে দেবীর প্রচলিত উমা আখ্যান দৃষ্ট হয়। অনেকের অভিমত এই যে, বেদশাস্ত্রে শক্তি উপাসনার বীজ নিহিত রহিয়াছে। মানব জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা দ্বারা সর্বত্রই কালের অপরিহার্য গতির সহিত চিন্তা ও ভাবধারার ক্রমবিকাশ পরিলক্ষিত হয়। যেমন প্রাচীন গ্রীস ও রোমের দেব দেবীগণের কথা ধরা যাউক; তাঁহারা বৈদিক দেবদেবী ছিলেন - একথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তুলনামূলক ভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন W.W.Hunter নিম্নোক্ত রূপেঃ-

"Several of the Vedic Gods were also Gods of Greece and Rome and to this day the deity is adored by Brahmins derived from the same Old Aryan root by Brahmin in Calcutta, by Protestant clergy of England and by Catholic Priests in Peru, e.g. (1) DYAUSH-PETAR in Sanskrit, the DIES-PITER or Jupiter of Rome, the ZEUS of Greece, the Law German DUUS, (2) Varuna in Sanskrit, URANUS in Latin, OURANOS in Greek, (3) Agni the God of fire, Latin IGNI-5"-Imperial Gazatteer.

অনুরূপভাবে ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে, সিন্ধুনদের অধিবাসীরা (২৫০০ খৃঃ পূঃ) শক্তি ইত্যাদির উপাসনা করিতেন-

"Thus the religion of the Indus people comprised:
(1) the worship of the Mother Goddess or Shakti etc" -Hindu Civilisation.

যাহা হউক বৈদিক যুগাবসানে রচিত হইল উপনিষদ। নারায়ণ উপনিষদে আদিশক্তি কন্যাকুমারী বা দুর্গিনামে অভিহিত হইতে দেখা যায়। ইহার

মধ্যে অন্যত্র দুর্গা শব্দও আছে। কেনোপনিষদে এই শক্তি আখ্যা উমা-হৈমবতী। শুক্ল যজুঃ সংহিতায় দেবী অর্থে অম্বিকা (দুর্গাবাচক) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বেদ গ্রন্থে যাঁহার বীজ মাত্র নিহিত ছিল, উপনিষদাদি পরবর্তী কালের শাস্ত্রাদিতে আমরা সেই বীজ হইতে শক্তিপূজার ক্রমবিকাশ দেখিতে পাই এবং তাহারও পরবর্তী সময়ে পৌরাণিক যুগে ও তন্ত্রের যুগে ইহা পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে।

ভারত ও বহির্ভারতের গিরিগহ্বরের কলাশিল্পে এবং অন্যত্র মৃৎ ধাতব ও প্রস্তরময় কত শক্তিমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হয়ত আরও হইবে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কল্যাণে। স্মরণ হয় ইলোরার বিখ্যাত মহিষমর্দিনী মূর্তি, উৎকীর্ণ কৈলাস-অচল নিবাসী হর-পার্বতীকে। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এই সব মূর্তি পরীক্ষার দ্বারা তাহাদের গঠনকাল ও কলা নৈপুণ্য নিরূপণ করিয়া থাকেন। পূর্বোক্ত মহিষমর্দিনী মূর্তি সুবিখ্যাত রামেশ্বর গুহায় অবস্থিত এবং ইহা খৃষ্টীয় সপ্ত শতকের। প্রসঙ্গতঃ আরও কয়েকটি মূর্তির উল্লেখ করা গেল - খিচিং-এ দশভূজা দুর্গামূর্তি (খৃষ্টীয় একাদশ শতকের), আর্কট জেলায় মহিষমস্তকোপরি অষ্টভূজা মূর্তি, দাক্ষিণাত্যে সুসংবদ্ধ অবস্থায় প্রাপ্ত মহিষমর্দিনী মূর্তি (একাদশ খৃষ্টীয় শতক), মহাবালিপুরমে চতুর্ভূজা মহিষমর্দিনী মূর্তি (খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতক), মাদ্রাজে প্রাপ্ত চামুন্ডা, মহাকালী, মহিষমর্দিনী, উমা মহেশ্বর প্রভৃতি প্রাচীন মূর্তি। উত্তরবঙ্গে কোনো এক কালীবাড়ীতে বত্রিশ হস্তযুক্তা চন্ডিকা এবং দশভূজা চামুন্ডা দেবীর আরাধনা প্রাচীন কাহিনীতে বিবৃত আছে। কুশান বংশীয় রাজগণের মুদ্রায় দেবীমূর্তি উৎকীর্ণ। বহির্ভারতে (যেমন সিংহল বা প্রাচীন তাম্রপর্ণী দ্বীপ, চীন) প্রাপ্ত হরপার্বতী, মহিষমর্দিনী প্রভৃতি মূর্তি সেই সুদূর অতীতে বহু ব্যাপক শক্তি ও অন্যান্য আরাধনার সাক্ষ্য দেয়। মূর্তি নির্ঘন্ট মাত্র এইখানেই শেষ নহে, প্রত্নতত্ত্বের আরও অনেক নিদর্শন শক্তিপূজার পর্যায়ে ধারাবাহিক না হইয়াও প্রাচীন ইতিহাসের সন্ধান কার্যের প্রচার করিতেছে।

বর্তমান শক্তিমন্ত্রের কেন্দ্র মার্কণ্ডেয় পুরাণ। ইহার দেবীমাহাত্ম্য অংশে, যেমন আশা করা যায়, দেবীর মহিমাদি সবিস্তারে কীর্তিত হইয়াছে। শাক্ত মন্দিরে ভারতের সর্বত্র ইহা নিয়মিতরূপে পঠিত হয়। সৃষ্টির আদিতে চণ্ডিকা মহাশক্তির আধার। তাঁহারই সহায়তায় ভগবান বিষ্ণু বধ করিলেন মধু ও কৈটভকে। বেদে অশ্বমেধের যে প্রকার প্রাধান্য, মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে কলিযুগে দুর্গাপূজারও সেই পর্যায়।

উক্ত পুরাণের আখ্যান অবলম্বনে সত্যযুগে সুরথ রাজা ও বৈশ্য সমাধি তিন বৎসর ব্যাপিয়া দেবীর আরাধনা করেন। পুরাণ বিশেষের মতে লঙ্কেশ্বর রাবণ ত্রেতাযুগে বসন্ত ঋতুতে দেবীর অর্চনা করিতেন এবং তাহাই বাসন্তী পূজা। শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কেশ্বর রাবণ বিনাশার্থে সৌর আশ্বিন মাসে ব্রহ্মার দ্বারা দেবীর বোধনসমাপনান্তে দুর্গাদেবীর অর্চনা করিয়াছিলেন

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরানং পঞ্চলক্ষনম্।।

মাঘ হইতে আষাঢ় মাস পর্যন্ত ছয় মাস উত্তরায়ণ এবং শ্রাবণ হইতে পৌষ অবধি দক্ষিণায়ন। উত্তরায়ণ দেবগণের দিবাভাগ, তখন তাঁহারা জাগ্রত। সেজন্য বাসন্তী পূজা, উত্তরায়ণের অর্চনা হিসাবে, যথাকালের পূজা। বিপরীতভাবে দক্ষিণায়নের ছয় মাস কাল তমিস্রাময় রাত্র, দেবগণ সুপ্ত; তাই শরৎকালের দুর্গাপূজা বেশী প্রচলিত হইলেও – অকালের পূজা। বোধন (বুধ=বোধি জাগানো) দ্বারা পূজার বিধি দেওয়া হয়। নিঃসন্দেহে বাসন্তী পূজায় বোধনের প্রশ্ন উঠে না।

শরতের মহাপূজার প্রচলন ভারতের সর্বত্রই রহিয়াছে, তবে ভিন্ন রাজ্যে বা প্রদেশে ভিন্ন পদ্ধতিতে বা আকারে। বহির্বঙ্গে অধিকাংশে স্থলে, যাহা বাঙ্গালী অধ্যুষিত নহে, চারিদিবস ব্যাপী দেবীমূর্তির পূজাবিধি প্রচলিত নাই। প্রবাসে বঙ্গবাসীরা যেখানে বসবাস করেন সেখানে বলা বাহুল্য দুর্গাপূজা নিয়মিত ভাবেই হইয়া থাকে। শুধু বঙ্গদেশ কেন, বহির্ভারতে, সাগর পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য প্রভৃতি স্থানেও কিরূপ সমারোহ সহকারে দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাহা সংবাদপত্র পাঠক মাত্রেই অবহিত আছেন। বঙ্গদেশের অধিবাসীরা যখন দুর্গাদেবীর অর্চনায় রত, অন্যত্র তখন নয় দিবসব্যাপী শ্রীশ্রীচণ্ডীর আরাধনা করা হয় এবং নিত্য তাহা পাঠ করা হয়। ইহা নবরাত্রি (আশ্বিন মাস শুক্ল প্রতিপদ হইতে নবমী পর্যন্ত নয়টি তিথির সমাহার) বা দশেরা নামে খ্যাত। মূলতঃ সমজাতীয় অনুষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও বাহ্যপদ্ধতিতে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। নবরাত্র উৎসব রামচন্দ্র কর্তৃক প্রথম প্রবর্তিত। রাবণের শিরশ্ছেদন হইলেও নূতন মুন্ডের আবির্ভাব দৃষ্টে রামচন্দ্র চিন্তাকুল হইয়া এহেন দানবকে কিরূপ সংহার করা যায় তাহার জন্য নব নব উপায় ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে দেবী দুর্গার আরাধনান্তে, অষ্টম দিবসে দেবী প্রসন্না হইলেন–রাবণ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। নবমী তিথিতে রামচন্দ্র শ্রদ্ধাঞ্জলিদানপূর্বক দশমী দিবসে বৃক্ষ বিশেষের সন্মুখে অর্চনা করিবার পর লঙ্কা ত্যাগ করিলেন।

রাজস্থান ও মহারাষ্ট্র অঞ্চলে দশেরা অতি মনোজ্ঞ উৎসব। প্রত্যুষে পদস্থ কর্মচারিবৃন্দ রাজসিংহাসন সমীপে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন জ্ঞাপন করেন। রাজগণকে অভিবাদন করিয়া সুদৃশ্য সমারোহ পূর্ণ শোভাযাত্রা তোপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখদিকে অগ্রবর্তী হয় রণদামামা, ঢোলক ইত্যাকার বাদ্য নির্ঘোষের সাথে সাথে শোভাযাত্রার অন্তভাগে সামন্তরাজগণ সৌষ্ঠবপূর্ণ যানে আরোহন করিয়া ইহার শোভা বিবর্ধন করিয়া থাকেন। বিভিন্ন পথ অতিক্রম করিয়া বিশালাকায় মিছিল হয়, হস্তী ও উষ্ট্রসহ বেদীশোভিত বৃক্ষতলে সমবেত তুলনীয় হয়। রাজগণ সেখানে পুরোহিত বর্গের সমক্ষে পূজা অর্চনাদি সুসম্পন্ন করিলে পর মিছিল স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিয়া আসে। সায়াহ্নে রাজপ্রাসাদে আমোদ প্রমোদের আয়োজন করা হইয়া থাকে। দরবারে সাড়ম্বরে উপাধি ও অভিজ্ঞানপত্র বিতরন করা হয়। ইতিহাস অনুধাবন করলে জানা যায় যে, এই পুণ্যদিনে রাজন্যবর্গ দেশ জয়ের অভিযান শুরু করিতেন। এই ধরনের দর্শনীয় সমাবেশ বিকানীর ও বরোদা প্রভৃতি রাজ্যে অনুষ্ঠানের সময় নানাদিক দেশ থেকে দর্শকবর্গ আকৃষ্ট হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে মহীশূরে (আধুনিক কর্ণাটক) দশেরার প্রবর্তন। চামুণ্ডা নামক পর্বতে চামুণ্ডেশ্বরীর আবাস। তিনিই ঐ স্থানীয় অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কাহারও কাহারও মতে 'মহীশূর' শব্দ মহিষমর্দিনী শব্দের অপভ্রংশ। তোপধ্বনির সহিত রাজপ্রাসাদ হইতে দশেরা শোভাযাত্রার সূত্রপাত। প্রথমেই থাকে হস্তীপৃষ্ঠে সুবৃহৎ পতাকা। রাজকীয় যান থাকে উষ্ট্রবাহিত। মহীশূর রাজ হস্তীপৃষ্ঠে ইহার অনুগমন করেন। অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী শোভাযাত্রার শোভা বর্ধন করেন। মণিমানিক্য, জরি, রেশম, হয়, হস্তী ও বাদ্য ইত্যাদি লইয়া ইহা এক অপূর্ব মনোরম দৃশ্য। ভারতের পার্বত্য জাতিদের মধ্যেও শারদ উৎসব কোনো না কোনো প্রকারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

পূর্বকালে ভারতে মহিষমর্দিনী পূজা প্রচলিত ছিল। এ সম্বন্ধে অক্ষয় কুমার মৈত্র লিখিয়া গিয়াছেন- "মহিষমর্দিনী পূজা অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। দুর্গাকে মহিষমর্দিনী বলিয়া ধরিয়া লইতে হইলে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, মহিষমর্দিনী পূজা অনেক বিষয়েই রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছে।

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষন্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদোজনাঃ।।
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষন্মাসা দক্ষিণায়ণম্।
তত্র চান্দ্রমাসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নির্যততো।।

যেখানে যুদ্ধরাগ, সেখানেই মা মহিষমর্দিনীর খেলা। দেহরাজ্যের শ্রেয় প্রেয়ের দ্বন্দ্ব যুদ্ধই হউক, আর ধরা রাজ্যের হিংসাদ্বেষপূর্ণ নরশোণিত পিপাসাই হউক- যেখানে জয় পরাজয়ের কলহ কোলাহল, সেখানেই মা মহিষমর্দিনীর খেলা।"

একৈব শক্তি পরমেশ্বরস্য
ভিন্নাচতুর্ধা বিনিয়োগকালে।
ভোগে ভবানী পুরুষেষু বিষ্ণুঃ
কোপেষু কালী সমরেষুদুর্গা ।।

অর্থাৎ অনুরূপভাবে-

I am Durga goddess of the proud and strong. And Lakshmi, Queen of the fair and fortunate; I wear the face of Kali when I kill, I trample the corpses of the demon hordes.

-Sri Aurobinda, Savitri Book Seven Canto Four

শ্রীরামানুজের অলৌকিকত্ব **ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য**

দক্ষিণ তথা সমগ্র ভারতের আধ্যাত্মিক সমাজে রামানুজ এমন এক নাম যা শুনলে আবালবৃদ্ধবণিতা মাথা নত করে থাকেন।

ভারতীয় আধ্যাত্মিক সমাজে আচার্য রামানুজের আবির্ভাব সত্যই এক বিস্ময়ের বিষয়। তাঁর আগমন ভারতে বৈষ্ণব মতের অভ্যুদয়কে ত্বরান্বিত করে। তিনি বিশিষ্টাদ্বৈত মতের প্রবর্তক ও প্রচারক। তাঁর প্রচারিত বিষ্ণু উপাসনা ও ভক্তি আন্দোলন পরবর্তী কালের বৈষ্ণব সাধকদের পাথেয় স্বরূপ হয়ে ওঠে। এই স্বনামধন্য সাধক এবং মহাপুরুষ ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত কেশবাচার্যের বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন।

অন্যান্য সাধু মহাপুরুষদের মত আচার্য রামানুজের জীবনে নানা প্রকার অলৌকিক ভাবের প্রকাশ দেখা যায়।

DO NOT COPY

সেই সময় আচার্য রামানুজের প্রভাব প্রতিপত্তি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। তাঁর ঐ প্রভাব নষ্ট করার জন্যে শ্রীরঙ্গম মঠের প্রধান পূজারী উঠে পড়ে লাগলেন। কারণ তিনি ভাবলেন, আচার্য রামানুজ দিনের পর দিন যেভাবে জন সমাদর এবং লোকখ্যাতির উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহন করছেন তাতে করে তাঁর প্রতিপত্তি ও লোকমান্যতা অচিরে ধূলিসাৎ হবার উপক্রম হয়েছে। তাই সেটা যাতে না হয় তার আগেই তিনি আচার্য রামানুজকে এই পৃথিবীর আলো-বাতাস হতে চিরকালের মত সরিয়ে দিতে মনস্থ করলেন। আচার্যকে বিষ খাইয়ে মারবার এক পরিকল্পনা রচনা করতে লাগলেন।

এই উদ্দেশে তিনি আচার্য রামানুজকে তাঁর বাড়ীতে একবার নেমন্তন্ন করে পাঠালেন। সেই সঙ্গে স্ত্রীকে উপদেশ দিলেন, দ্যাখো, রামানুজকে এখানে আসতে বলেছি। সে এলে তাকে বেশ যত্ন খাতির করবে। আর তাঁর খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেবে।

যথা সময়ে রামানুজ এলেন প্রধান পূজারীর ঘরে। হাত-পা ধুয়ে খেতে বসলেন।

পূজারীর স্ত্রী খাবারের থালা নিয়ে এলেন রামানুজের সামনে। এই খাবারে স্বামীর কথামত বিষ মিশিয়ে দিয়েছেন।

বিষ মেশানো খাবার এনে রামানুজের সামনে দাঁড়াতেই তাঁর মনে পরিবর্তন এলো।

সর্বজন শ্রদ্ধেয় আচার্য রামানুজের অপরূপ কান্তি এবং সাধন ঐশ্বর্য দেখে তিনি ঘাবড়ে গেলেন। ভাবলেন, এমন এক গুণী এবং নির্দোষ, ভগবানের সেবক এবং আচার্যের প্রাণ নাশ করবার জন্যে আমি বিষ মেশানো খাবার দিতে যাচ্ছি। এতে করে আমার যে নরকেও স্থান হবে না। এ আমি কি করতে চলেছি?

এইরূপ চিন্তা পূজারী-পত্নীর চিত্তকে সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত করে দিলো।

তিনি আর রামানুজকে খাদ্য পরিবেশন করতে পারলেন না। তার বদলে তিনি আচার্যকে করুণ স্বরে বলতে লাগলেন, বৎস এ খাবারে বিষ মেশানো

DO NOT COPY

আছে। তুমি এ খাবার খেয়ো না। তুমি বরং অন্য জায়গা হতে খাবার খাও। এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আচার্য রামানুজ ভোজনের আসন হতে উঠে পড়লেন। তখনকার মত ষড়যন্ত্রের কারসাজি বিনষ্ট হলো।

রামানুজকে মারবার জন্যে স্ত্রীকে পরামর্শ দিয়েছিলান প্রধান পুজারী। স্ত্রী সেই কাজে ব্যর্থকাম হলেন। তখন স্ত্রীর ওপর ক্রোধ গেল বেড়ে। সেই সঙ্গে রামানুজের প্রতিও। তাই তিনি মনে মনে অন্য এক মতলব আঁটলেন। ভাবলেন, এবার আমি নিজের হাতে রামানুজকে বিষ খাওয়াবো। দেখি এবার সে কেমন করে বাঁচে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় রামানুজ এসেছেন শ্রীরঙ্গম মন্দিরে। তাঁকে দেখেই প্রধান পূজারী সহাস্যে এগিয়ে এসে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর তাঁকে নানাপ্রকার মিষ্টি কথায় তুষ্ট করে বিগ্রহের প্রাণাভিষেক-জল পান করতে দিলেন। ঐ জলে মেশানো ছিল তীব্র বিষ। আচার্য রামানুজ কিছুমাত্র দ্বিধা না করে সেই বিষ নিমেষে গলাধঃকরণ করলেন। অভিষেকবারি পান করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সর্ব শরীর ও মনে এক অস্বাভাবিক পুলকের সঞ্চার হল। শ্রীবিগ্রহের প্রতি ভক্তিভাব বেড়ে গেল।

ওদিকে প্রধান পূজারীর খুব আনন্দ হতে লাগলো। তিনি ভাবছিলেন, যাক, এতদিনে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়েছে। এবার ওকে নিজের হাতে বিষ খাইয়েছি। সুতরাং মৃত্যু অনিবার্য।

আচার্য রামানুজের মনে কোন বিকার দেখা গেল না। বরং তাঁর মন ভক্তিভাবে আন্দোলিত হতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরেই কীর্তন শুরু হল। হরি কীর্তনের মহারোল আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দিগ-দিগন্তে ছুটে যেতে লাগলো। আচার্য রামানুজ তাঁর শিষ্য ও অনুরাগীদের নিয়ে সেই কীর্তনে যোগ দিলেন। তিনি দিব্যভাবে বিভোর হয়ে সেই কীর্তন শুনে চলেছেন। তাঁকে ঘিরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে দিব্যজ্যোতির ছটা। ভক্তরা তাঁর দিকে অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছে। আহা! কি সুন্দর রূপ রামানুজের! মহাভাবের প্রকাশ ঘটেছে। প্রধান পূজারীও তন্ময় হয়ে তাকিয়েছিলেন আচার্যের দিকে।

DO NOT COPY

কিছুক্ষণ তাকাবার পর তিনিও মুগ্ধ না হয়ে পারলেন না। ভাবলেন, কাকে কি খাওয়াতে গেছেন। এ যে এক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ। তাই তাঁর মন অনুশোচনায় ভরে গেল। তিনি তখুনি জনতার বেষ্টনী অতিক্রম করে দৌড়ে গিয়ে আচার্য রামানুজের চরণে পড়ে গেলেন। কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, যোগীরাজ, আমি মহা পাতকী। তুমি আমায় ক্ষমা করো। আমি তোমাকে বিষ খাইয়ে মারবার জন্য পরিকল্পনা করেছিলুম। আজ দেখছি, আমার সেসব পরিকল্পনা বানচাল হতে বসেছে। আমি ভুল পথে চলেছিলুম। তুমি আমাকে সেই পথ দেখিয়ে দিলে। তুমি আমার মত পাতকীকে উদ্ধার করতে এসেছ। তুমি আমাকে পথ দেখিয়ে দাও। আমাকে তোমার চরণে স্থান দাও।

আচার্য রামানুজের তখন অর্দ্ধবাহ্য দশা। তিনি সেই অবস্থায় অনুতপ্ত ক্রন্দনরত প্রধান পূজারীর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ জানিয়ে বলতে লাগলেন, ভাই, তোমার অপরাধের জন্যে তুমি দুঃখ কোরো না। শ্রীরঙ্গনাথজী তোমার অপরাধ ক্ষমা করেছেন। তুমি এখন থেকে মানুষের প্রতি প্রীতির ভাব নিয়ে তাদের সেবাযত্ন করতে থাকো।

সেদিন থেকে প্রধান পূজারীর মনে ভাবের পরিবর্তন দেখা গেল। কালে তিনি হয়ে উঠলেন একজন যথার্থ বৈষ্ণব।

বেশ কয়েকজন জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি শিষ্য হলেন আচার্য রামানুজের। তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন দাশরথি, সুরেশ, সুন্দরবাহু, শোট্টিনাম্বি, সৌম্য নারায়ণ, যজ্ঞমূর্তি আর গোবিন্দ।

তাঁদের দ্বারা আচার্য রামানুজ শাস্ত্রের গুহ্য বিষয়গুলি প্রবন্ধের আকারে জনসমাজে প্রচার করতে লাগলেন। তার নাম দিলেন দ্রাবিড়-প্রবন্ধমালা। একে দ্রাবিড়বেদও বলা চলে। সকলের শেষে রচনা করেন শ্রীভাষ্য। এই শ্রীভাষ্য রচনার অন্তরালে এক অলৌকিক ব্যাপার আছে। আচার্য রামানুজ গুরুর মত ও পথ অনুযায়ী এই সব লেখার কাজ করে চলেছেন।

শ্রীভাষ্য লেখার মূলেও ছিল শ্রীগুরুর অনুপ্রেরণা এবং তাঁর শ্রীগুরুর নিকটে দৃঢ়সঙ্কল্প। এবার তিনি সেই কাজে ব্রতী হলেন। কিন্তু এই ভাষ্য লিখতে হলে বোধায়ন-বৃত্তির সাহায্য নেওয়া দরকার। সেই অমূল্য গ্রন্থখানি রয়েছে

কাশ্মীরের সারদাপীঠে। সুতরাং আচার্য রামানুজ তাঁর প্রধান শিষ্য সুরেশের সঙ্গে চলে এলেন কাশ্মীরের সারদাপীঠে। কিন্তু এখানে এসে তিনি এক প্রচণ্ড বাধার সন্মুখীন হলেন।

সারদাপীঠের পণ্ডিত সমাজ আচার্য রামানুজকে ঐ গ্রন্থ ব্যবহার করতে দিলেন না। একটা মিথ্যা কারণ দেখিয়ে বললেন, ঐ গ্রন্থখানি কীট খেয়ে ফেলেছে। সুতরাং ওকে কিভাবে আপনি পাবেন। গ্রন্থখানি বিনষ্ট হয়েছে।

পণ্ডিতদের কথা শুনে হতাশ হলেন আচার্য। ভাবলেন, সুদূর শ্রীরঙ্গম হতে কাশ্মীরে বহু কষ্ট করে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছেন। এই অবস্থায় তিনি গ্রন্থখানি পেলেন না। এর চেয়ে মর্মন্তুদ কাহিনী আর কিবা হতে পারে।

সেদিন আচার্য রামানুজ ভগ্ন মনোরথ হয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে আছেন। মনে মনে শ্রীরঙ্গনাথজীকে স্মরণও করছেন। সেই রাতে তিনি দেখলেন এক অলৌকিক কান্ড। দেখলেন, দেবী সারদা নিজে এসে দাঁড়িয়েছেন আচার্যের সামনে। তাঁর হাতে শোভা পাচ্ছে সারদাপীঠের বিখ্যাত 'বোধায়ন-বৃত্তি' নামক গ্রন্থখানি।

পরে তিনি সেই গ্রন্থখানি আচার্যের হাতে দিয়ে বললেন, বৎস, এ গ্রন্থ এখানে বর্তমান থাকা সত্বেও তোমাকে এরা দিতে চায় নি। তোমার উদ্দেশ্যমূলক কাজের জন্যে আমি এই গ্রন্থ তোমাকে দিচ্ছি। তুমি এক্ষুনি এই গ্রন্থখানি নিয়ে এখান থেকে চলে যাও। তা না হলে এরা তোমার কাছ থেকে এই গ্রন্থখানি ছিনিয়ে নিতে পারে।

দেবীর কাছ থেকে ঈপ্সিত গ্রন্থখানি পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন আচার্য রামানুজ। তিনি মনে মনে শ্রী রঙ্গনাথজী এবং দেবী সারদাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে লাগলেন। পরে দেবীর কথামত উক্ত বইখানি নিয়ে প্রধান শিষ্য কুরেশের সঙ্গে রওনা হলেন নিজের দেশের দিকে।

এরপর কয়েকদিন কেটে গেল। সারদাপীঠের পণ্ডিতরা ঐ বইটি পেলেন না। তাঁদের মনে খুন চেপে গেল। তাঁরা ভাবলেন, নিশ্চয়ই ঐ পণ্ডিতদের কাজ। ওঁরাই ঐ গ্রন্থটিকে চুরি করে নিয়ে গেছেন। তখন কয়েকজন কাশ্মীরী ঘোড়া ছুটিয়ে দাক্ষিণাত্যের দিকে এগোতে লাগলো। পথের মধ্যে তারা ধরে ফেললো

আচার্য এবং তাঁর প্রিয় শিষ্য কুরেশকে। তারপর তারা গ্রন্থখানি ছিনিয়ে নিয়ে আবার ফিরে চললো কাশ্মীরের সারদাপীঠে।

ওদিকে মহা মূল্যবান গ্রন্থটি হারিয়ে মহা দুশ্চিন্তায় পড়লেন আচার্য। তাঁকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখে প্রিয় শিষ্য কুরেশ বলতে লাগলেন, প্রভু, এর জন্যে আপনি আদৌ দুঃখিত হবেন না। এ ক'দিনে আমি বোধায়ন বৃত্তিটি পড়ার সুযোগ পেয়েছি। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে আপনি যখন রাতে গভীর নিদ্রা যেতেন তখন আমি এই গ্রন্থটি পড়ে নিয়েছি। ওর সার বস্তু আমি জেনে নিয়েছি। আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি ক'দিনের মধ্যেই ঐ গ্রন্থটি আমার স্মৃতি হতে লিখে ফেলছি।

দুশ্চিন্তার মেঘ কেটে গেল। রামানুজ প্রতিভাধর শিষ্যকে পুনঃ পুনঃ আশীর্বাদ জানালেন। পরে কুরেশের চেষ্টা ও যত্নে 'বোধায়ন বৃত্তি'র পুনরুদ্ধার হয় এবং শ্রীরঙ্গম মঠে ফিরে এসে রামানুজ তাঁর ভাষ্য রচনা শেষ করেন।

ঈশ্বর যার সহায় তিনি শতরকম আপদ বিপদের মাঝে থেকেও কাজ করে যাবেন। পরিণামে সাফল্য লাভ করবেন।

** ** **

মহাপুরুষ রামানুজের অলৌকিক বিভূতির যেন সীমা-পরিসীমা নেই। চোল রাজ্যের রাজা হলেন ভূমিকন্ঠ। তিনি ছিলেন শৈব মতাবলম্বী। তাই বৈষ্ণব রামানুজকে এবং তাঁর প্রচারিত মতামতকে দু'চক্ষে দেখতে পেতেন না।

রাজধানী কাঞ্চীতে বসে তিনি মতলব করতে লাগলেন কিভাবে রামানুজ এবং তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি নষ্ট করবেন। এই উদ্দেশ্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। এক সময় তিনি রামানুজকে ডেকে পাঠালেন কাঞ্চীতে। রাজার আহ্বানে রামানুজ যেতে চাইলেন রাজধানী কাঞ্চীতে। কিন্তু বাদ সাধলেন তাঁর প্রিয় শিষ্য কুরেশ। তিনি বললেন, গুরুদেব, আপনার পক্ষে কাঞ্চিতে যাওয়া আদৌ যুক্তিযুক্ত হবে না। কারণ চোল রাজ হচ্ছেন ঘোর বৈষ্ণব বিদ্বেষী। আপনি সেখানে গেলে রাজা আপনার ক্ষতি করবেন। তার চেয়ে বরং আমি ছদ্মবেশ ধরে চোলরাজার কাছে যাই। আপনি অন্যত্র সরে পড়ুন। পারেন তো কোন অরণ্যে আত্মগোপন করুন।

ওদিকে কুরেশ ছদ্মবেশে গেলেন কাঞ্চীতে। দেখা করলেন চোল রাজার সঙ্গে। চোলরাজা তাঁকে দেখা মাত্র সরোষে বলতে লাগলেন, এই দুর্বৃত্তের উপযুক্ত দণ্ড হচ্ছে মৃত্যু। কিন্তু না, এ একসময় আমার বোনকে দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে বাঁচিয়েছে। সুতরাং ওর প্রতি আমি নেমকহারামি করবো না। তার চেয়ে ওকে একটু লঘু শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। ওর চোখ দুটি অন্ধ করে দিতে হবে।

রাজার ঐ প্রস্তাব শুনে আনন্দিত হলেন কুরেশ। ভাবলেন, এতো ভাল কথা। চোখের দৃষ্টি না থাকলে বাইরের দৃশ্য দেখতে পারবো না। তখন আমার দৃষ্টি চলে যাবে অন্তরের দিকে। তাতে করে সাধন ভজন করা সুবিধে হবে।

রাজা তাঁর আদেশ পালন করলেন। তাঁর অনুচরবৃন্দ কুরেশকে অন্ধ করে ছেড়ে দিলেন। কুরেশ অন্ধ হয়ে ফিরে গেল শ্রীরঙ্গমে। এর কিছুদিন পর চোলরাজ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন।

পরে আচার্য রামানুজের অলৌকিক কৃপায় কুরেশ তাঁর লুপ্ত দৃষ্টিশক্তি আবার ফিরে পেলেন।

আচার্য রামানুজ তখন যাদবাদ্রিতে রয়েছেন। গুরুর শ্রীচরণ বন্দনা করবার জন্যে ভক্ত কুরেশ সেখানে উপস্থিত হলেন। আচার্য কুরেশকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করার পর বললেন, বৎস, তুমি শ্রীরঙ্গমের কাছে তোমার চোখদুটি ভিক্ষে চাও। তাঁর কৃপায় তুমি অচিরে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে।

গুরুর নির্দেশ মাথা পেতে নিলেন কুরেশ। তিনি চলে গেলেন কাঞ্চীতে শ্রীবরদারাজের মন্দিরে।

কিন্তু শ্রীবিগ্রহের সামনে তিনি নিজের কথা বলতে পারলেন না। তার জায়গায় জানালেন অন্য কথা। বললেন, ঠাকুর, আমার চোখ দুটি যে নিয়েছে তার মঙ্গল হোক। তার গ্রামের সকলের মঙ্গল হোক-উন্নতি হোক। ভক্তের সামনে এসে শ্রীবরদারাজ বললেন, তাই হবে। তোমার প্রার্থনা অচিরেই পূর্ণ হবে। রামানুজ শুনলেন ঐ খবর। তিনি কুরেশকে বলে পাঠালেন, বৎস, আমি তোমার কথা সব শুনেছি। তুমি পরের মঙ্গলের জন্য শ্রীবিগ্রহের কাছে যে প্রার্থনা করেছ

তার জন্যে আমি খুব আনন্দিত। তবে এতে রয়ে গেছে নিজের স্বার্থ। এবার তুমি নিজের বদলে আমাকে আনন্দ দান করো না কেন?

কুরেশ তখন বললেন, আপনার আনন্দের জন্য কি কাজ করবো আদেশ দিন। রামানুজ এবার কুরেশের মুখের দিকে তাকিয়ে সহাস্যে বললেন, শ্রীবিগ্রহের কাছে তোমার নয়ন ভিক্ষা করলেই আমার আনন্দ হবে। তুমি কি জানো না যে যে মুহূর্তে তুমি আমাকে গুরুরূপে বরণ করেছ সেই মুহূর্তে তুমি আমার হয়ে গেছ। তোমার শরীর ও মন, তোমার নয়, আমার। সুতরাং আমার যাতে আনন্দ হয় তুমি তাই করো।

গুরুদেবের কথা শুনে আনন্দে নাচতে লাগলেন একান্ত ভক্ত কুরেশ। সেই সঙ্গে বলতে লাগলেন, এতদিনে আমার জীবন ধন্য হলো। গুরুদেব আমার মত মহাবিষয়ীকে কৃপা করেছেন। আমি এবার নিশ্চিন্ত মনে শ্রীবরদরাজের কাছে নয়ন ভিক্ষা করবো।

তাই করলেন কুরেশ। শ্রীবরদরাজের মন্দিরে গিয়ে গুরুদেবের কথামত কাতরভাবে নয়ন ভিক্ষা করলেন। শ্রীবরদরাজও কৃপা করলেন কুরেশকে। অচিরে কুরেশ আবার সেই আগের মত তাঁর লুপ্ত দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন।

গুরু আর ইষ্টদেব যে অভিন্ন এবং এক। গুরুর সঙ্গে তাঁর কোন ভেদ নেই। স্বয়ং ইষ্টদেবই গুরুরূপে আসেন ভক্তকে কৃপা করতে। তাই গুরুসেবাই ইষ্টসেবা। গুরুর বাক্যই ইষ্টবাক্য। গুরু রামানুজের মধ্যে শ্রীবরদরাজ আবির্ভূত হয়ে অলৌকিক লীলা করেছেন। তাই গুরুর কৃপায় কুরেশ ধন্য হয়ে গেলেন।

হায়! **শ্রীপ্রকাশ অধিকারী**

একটা কথা এখন খুব শোনা যায় ---
সন্ত্রাসের কোন ধর্ম হয় না।
তবে কি ধর্মের কোন সন্ত্রাস হয়?

DO NOT COPY

সন্ত্রাসের নাকি কোন দেশও হয় না!
তবে কি দেশের কোন সন্ত্রাস হয়?
কোন দেশ, কোন সন্ত্রাস?

আরও একটি মহৎ কথা রটে যায় ---
সব মৃত্যুই সমান।
কার মৃত্যু, কোন মৃত্যুর তরে এই ফরমান?

সময় বুঝে এই বার্তা দিলে পরে
অভিপ্রায়টা ঠিক বোঝা যায়
আমাদের অভিজ্ঞতায় ---
আসল প্রশ্নটা বুঝি এই ---
রাজনীতির কোন সন্ত্রাস হয়?
কোন রাজনীতি, কোন সন্ত্রাস?
উত্তরটা আমার জানা নাই।
ক্ষমা চাই ---

মহাকাল **শ্রীমতী প্রতিমা নাগ**

পাথরের মুখ নিয়ে বসে আছে মহাকাল
নির্নিমেষ, নিরপেক্ষ চাহনি
সহস্র বলিরেখায় জর্জর,
শীর্ণ অঙ্গুলিতে ইতিহাস ঘাঁটে,
তীক্ষ্ণ নখের আঘাতে রক্তাক্ত করে বর্তমান।
আগামীর প্রত্যাশা বিহীন
শুধু যাপন করার জন্য,
শুধুমাত্র যাপন করার জন্যই,
অকারণ সময় কাটে
আদি হতে অন্তঃকাল
নিঃসঙ্গ একাকী মহাকাল।।

DO NOT COPY

মৃত্যু উপত্যকা পেরিয়ে

সুনন্দন ঘোষ

আমার মাথাটা কাবুলের মাটিতে পড়ে ছিল, কারণ
আমি ভলিবল খেলতাম।
আমার রক্তাক্ত শরীর পড়ে ছিল কুমিল্লায়, কারণ
আমি দুর্গাপুজো করছিলাম।
পুলিশের হাঁটুর নীচে আমার দম বন্ধ হয়ে গেছিলো
মিনিয়াপোলিসে, কারণ
কালো মানুষ হয়েও আমি মর্যাদা চেয়েছিলাম।

এই উপমহাদেশে সত্তর বছর ধরে অধর্মের দাঙ্গায় আমার
মৃত্যু হয়েছে অন্ততঃ দশ হাজার বার,
কখনো সংখ্যালঘু, কখনো সংখ্যাগুরু রূপে।

হত্যার নীরব আয়োজন পৃথিবী জুড়ে।
অ্যানা ফ্রাংক থেকে ইন্দিরা,
ওলফ পামে থেকে নেমৎসোভ –
ড্রাকুলার প্রাসাদে পালিত হয় নির্মম মৃত্যুর দূত।

তবুও অদম্য এ প্রাণ।
ভূমিকম্পের ধ্বংসাবশেষে শিশুর কান্না,
জলসাঘরের ভাঙ্গা ছাদে বেড়ে ওঠা বট-অশ্বত্থের চারা।
বৈদান্তিক সন্ন্যাসী এই ভূখণ্ডেই কুমারী পুজোর
জীবন্ত প্রতিমা খুঁজে পান নবীর অনুগামীর ঘরে।

পৃথিবীজোড়া উপত্যকায় বারবার মৃত্যুর হানাদারী,
ষড়যন্ত্র, বিতর্ক, বিদ্বেষ;
তবু ফিরে আসি বারবার,
জন্ম থেকে জন্মান্তরে,
এক বিন্দু অমৃতের লোভে।

DO NOT COPY